আমার অভিজিৎদা...

নোবেলপ্রাপক পণ্ডিত যখন আর এক গুণী পণ্ডিতের শিক্ষক হন, তখন পুঁথিগত শিক্ষাদানের ঊর্ধ্বে ওঠে বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবার স্বাধীনতা। শিক্ষক দিবসের মাসে কলেজের সিনিয়র দাদা তথা শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়-কে শ্রদ্ধা জানালেন অর্থনীতিবিদ মৈত্রীশ ঘটক।

নোবেল পুরস্কারের সর্বজনমান্যতার মহিমায় বছর চারেক হয়ে গেল। আমি যে কথাটা তিন দশকের বেশি ধরে জানি, তা এখন আক্ষরিক অর্থেই সর্বজনবিদিত— অর্থবিদ্যার গবেষণার সমসাময়িক জগতে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠদের মধ্যে পড়েন। আমি নব্বই দশকের গোড়ায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিজিৎদার একেবারে প্রথম দিককার পিএইচডি ছাত্র হওয়ার সুবাদে একদম প্রথম পর্যায় থেকে তাঁর কাজের সঙ্গে পরিচিত।

যখন হার্ভার্ডে পিএইচডি করতে যাই, তখন আমি অভিজিৎদাকে চিনতাম দীপকবাবুর ছেলে হিসেবে। দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের প্রেসিডেন্সির অর্থনীতির হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট এবং প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক, যিনি তাঁর পড়ানো এবং তীক্ষ্ণ রসবোধের জন্যে সমমাত্রায় বিখ্যাত ছিলেন। দীপকবাবু ওঁর মহানির্বাণ রোডের বাড়িতে আলাপও করিয়ে দিয়েছিলেন অভিজিৎদার সঙ্গে, আমার বিদেশযাত্রার ঠিক আগে। তখন অভিজিৎদা প্রিন্সটনে পড়াতেন, ছুটিতে কলকাতায় এসেছেন। জানালেন যে উনি এই বছর (অর্থাৎ, আমার প্রথম বছরে) প্রিন্সটন থেকে ছুটি নিয়ে হার্ভার্ড ভিজিট করছেন, ওখানে দেখা হবে। বিদেশে যাওয়ার মুখেই একই বিষয়ের পরিচিত বৃত্তের একজনের সঙ্গে আলাপ হয়ে ভরসা পেলাম, যে প্রয়োজনে পরামর্শ নিতে পারব। তখনও ধারণাই ছিল না যে এক বছরের মধ্যেই উনি আমার শিক্ষক এবং গবেষণার সহ-উপদেষ্টা হয়ে দাঁড়াবেন।

ষাটের দশক থেকেই অর্থনীতির গবেষণার জগতে ভরকেন্দ্র ইংল্যান্ড থেকে সরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকছিল। আগে কেমব্রিজ, অক্সফোর্ড এবং লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স অর্থনীতি চর্চার পীঠস্থান বলে ধরা হতো, আস্তে আস্তে মার্কিন দেশের পূর্ব উপকূলে ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের কেমব্রিজ শহরে (যাকে মূল কেমব্রিজের সঙ্গে তফাত করতে কেমব্রিজ-ম্যাস বলা হয়) হার্ভার্ড এবং এমআইটি হয়ে দাঁড়াল অর্থনীতি গবেষণার মূল ভরকেন্দ্র। তার সঙ্গে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় যা মুক্ত-বাজারপন্থী মতাদর্শের জন্যে বিখ্যাত, বার্কলি, স্ট্যানফোর্ড, প্রিন্সটন, ইয়েল ইত্যাদি আরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় সারা বিশ্বে আমার মতো তরুণ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী গবেষকদের জন্যে সবচেয়ে আকর্ষক গন্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হার্ভার্ডে প্রথম বছরের বাধ্যতামূলক পাঠক্রমের ধাপ পেরিয়ে দ্বিতীয় বছরে যখন গবেষণার বিষয় নির্বাচন করার সময় এল, তখন ভারতের মতো দেশে বড় হয়ে ওঠার সুবাদে

(এবং পারিবারিক পরিবেশ ও কলেজ-জীবনে বামধারার ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত থাকার কারণে মার্ক্সবাদী অর্থনৈতিক চিন্তাধারার প্রভাবও ছিল) দারিদ্র ও উন্নয়নের সমস্যা নিয়ে মূলধারার বাইরে বেরিয়ে কাজ করার ইচ্ছে দানা বাঁধছিল। কিন্তু সমস্যা হল, সেই সময়ে উন্নয়নের অর্থনীতির গবেষণার জগতে একটু ভাটা চলছিল। পঞ্চাশ থেকে ষাট-সত্তরের দশকে উন্নয়নের অর্থনীতির গবেষণার জগতে একটা বড় জোয়ার এসেছিল, যাতে আর্থার লুইস, রবার্ট সোলো, অমর্ত্য সেন বিভিন্নভাবে অগ্রগামী পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। তারপর সত্তর ও আশির দশক ছাপিয়ে ছিল জোসেফ স্টিগলিৎজ, রবার্ট অ্যাকার্লফ, প্রণব বর্ধন, অ্যাঙ্গাস ডিটনদের কাজ। কিন্তু নব্বইয়ের দশকে সম্পূর্ণ নতুন ধারার কোনও কাজ সেরকম চোখে পড়ছিল না। তাই আমার প্রজন্মের উদীয়মান গবেষকরা পথ খুঁজছিলেন।

আমার সৌভাগ্য যে সামাজিক সূত্রে পরিচয় হলেও, অভিজিৎদার হার্ভার্ডে তাঁর কয়েক বছরের জুনিয়র অ্যান্ড্রু নিউম্যানের সঙ্গে লেখা 'অকুপেশনাল চয়েস অ্যান্ড দ্য প্রসেস অব ডেভেলপমেন্ট' নামক একটি তখনও অপ্রকাশিত তাত্ত্বিক গবেষণাপত্র পড়ে আমার মনে হল, ঠিক এইরকম কিছুরই দিশা খুঁজছিলাম। পরের বছর যখন জানতে পারলাম অভিজিৎদাকে হার্ভার্ড এক বছরের জন্যে আমন্ত্রণ করে আনলেও, তাকে তারা চাকরির প্রস্তাব দিয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে এবং তিনি তাতে রাজি, তৎক্ষণাৎ ওঁকে গিয়ে বললাম, তোমার সঙ্গেই কাজ করতে চাই। (এখানে উল্লেখ করা উচিত যে দীপকবাবুর ছেলে হিসেবে আলাপ হওয়ায় এবং একই কলেজে পড়ার সূত্রে প্রথম থেকেই আমার সঙ্গে খানিকটা কলেজের সিনিয়র দাদার মতোই সম্পর্ক ছিল, তাই অধ্যাপক হলেও কখনও 'আপনি' বলিনি)। অভিজিৎদা তখনও উদীয়মান তারকা বলে চিহ্নিত হলেও প্রতিষ্ঠিত গবেষক নন, আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবেই আমায় পরামর্শ দিলেন যে আলাপ, আলোচনা, পরামর্শের জন্যে উনি তো রইলেনই, কিন্তু আরও বর্ষীয়ান কাউকে প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচন করলে কেরিয়ারের দিক থেকে আমার পক্ষে শ্রেয় হবে। আমি জানতাম অভিজিৎদার অর্থনীতির জগতের সর্বোচ্চ স্তরে উত্থান সময়ের অপেক্ষামাত্র, কিন্তু তাও তাঁর পরামর্শে সুবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এরিক ম্যাসকিনকে আমার প্রধান উপদেষ্টা হতে অনুরোধ করলাম। এরিক ২০০৮ সালে নোবেল পুরস্কার পান, এবং মজার ব্যাপার হল যে তিনি অভিজিৎদা যখন হার্ভার্ডে ছাত্র ছিলেন, তাঁরও সহ-উপদেষ্টা ছিলেন।

পরে জেনেছি যে অভিজিৎদাকে হার্ভার্ডে নিয়ে আসার একটা কারণ ছিল উন্নয়নের অর্থনীতিতে নতুন উদ্ভাবনী ধারা আসার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একটা উপলব্ধি সেই সময়ে অর্থবিদ্যাচর্চার জগতে সাধারণভাবেই অনুভূত হচ্ছিল। আর তার কেন্দ্র হওয়ার কারণে এই চিন্তাকে কাজে রূপায়ণ করার জন্যে হার্ভার্ড-এমআইটি সপ্রচেষ্ট ছিল। অভিজিৎদা একা নয়, আরও কিছু উদীয়মান নক্ষত্র সেই সময়ে কেমব্রিজ ম্যাস শহরের এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছিলেন, তাঁদের মধ্যে মাইকেল ক্রেমার, টমাস পিকেটি, ড্যারন আসেমগ্লু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাগ্যক্রমে আমি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় শুধু ছিলাম তা নয়, অভিজিৎদাকে প্রথমে শিক্ষক ও পরে উপদেষ্টা হিসেবে পেয়ে উন্নয়নের অর্থনীতিতে যে জোয়ার তখন আসছিল, তার প্রথম প্রজন্মের ছাত্র ও গবেষক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলাম। অর্থনৈতিক গবেষণা সেই সময় প্রধানত তাত্ত্বিক স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল, যদিও তার মধ্যেই তত্ত্বের সঙ্গে তথ্য বিশ্লেষণের চর্চার দিকে ঝোঁক একটু একটু করে বাড়ছিল।

আড্ডার মেজাজে

আমি পিএইচডি শেষ করি ১৯৯৬ সালে, তারপর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে সহায়ক অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিই। তার কয়েক বছর পরে নিজের গবেষণার ধরন সম্পূর্ণ পাল্টে অভিজিৎদা তাত্ত্বিক গবেষণা ছেড়ে ঝোঁকেন তথ্যবিশ্লেষণ ও সমীক্ষামূলক কাজের একটি বিশেষ ধারার দিকে, যা এখন র‍্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল (আরসিটি) বলে বিখ্যাত এবং যার সুবাদে তিনি, মাইকেল ক্রেমার এবং এস্থার দুফ্লো ২০১৯ সালে নোবেল পুরস্কার পান। তবে সেই ধারার সঙ্গে আমি কখনওই প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলাম না, তাই আমার পিএইচডি করার সময়ে অভিজিৎদার ছাত্র হওয়ার অভিজ্ঞতাই এখানে বর্ণনা করব।

ভালো শিক্ষক একাধিক রকমের হতে পারে। এক ধরনের ভালো শিক্ষক কোনও কিছু খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন, যাতে মনে হয় বাহ্, আর পাঠ্যবই না পড়লেও চলবে। কিন্তু তাঁদের পড়ানো থেকে সেই বিষয়ে আরও জানার ইচ্ছে নাও বাড়তে পারে, মনে হতে পারে, যা জানার বোঝার সবই তো উনি বললেন। আবার কিছু শিক্ষক আছেন যাঁরা যা বলেন তা যে সম্পূর্ণ বোধগম্য হয়, তা নয়। শুধু তাই না, এই বিষয়ে কী কী প্রশ্নের উত্তর এখনও অজানা বা অস্পষ্ট সেটাও পড়াতে গিয়ে তাঁরা কী জানা, তার সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু ছাত্রদের পরে সেই বিষয়ে কিছু চিন্তা ও প্রশ্ন ভূতের মতো মাথায় চাপে, আরও পড়ার, ভাবার, এবং জানার অদম্য ইচ্ছে জাগে, প্রায় নেশার মতো। আমি প্রথম ঘরানার অনেক ভালো শিক্ষক পেয়েছি, অনেক কিছু শিখেছি তাঁদের কাছে, কিন্তু অভিজিৎদা এই দ্বিতীয় ঘরানার একজন আদর্শ শিক্ষক। যা জানলাম বা বুঝলাম তার থেকেও যা মাথায় ঘুরত যে কত কী জানা নেই, কতরকম প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর নেই।

> নিজের গবেষণার ধরন সম্পূর্ণ পাল্টে অভিজিৎদা তাত্ত্বিক গবেষণা ছেড়ে ঝোঁকেন তথ্যবিশ্লেষণ ও সমীক্ষামূলক কাজের একটি বিশেষ ধারার দিকে...।

আসলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানচর্চা অপরিচিত কিন্তু অজ্ঞাত নয় এমন কোনও অঞ্চলের ম্যাপ ধরে এগনোর মতো – কী জানি এবং কী জানি না দুটোই প্রথম থেকে পরিষ্কার কেননা সবই কেউ যত্ন করে নথিবদ্ধ করে গিয়েছেন, আমাদের কাজ শুধু নিজেরা বুঝে নেওয়া। কিন্তু ভাবুন অজানা এবং অচেনা কোনও দ্বীপে, যেখানে কোনও ম্যাপ হাতে নেই, সেখানে আমরা কীভাবে এগবো? একটা আন্দাজ নিয়ে হাঁটা শুরু করা, তারপর আবার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সেই আন্দাজকে পরিমার্জন করে নেওয়া, আবার হাঁটা, আবার অভিজ্ঞতা, আবার পরিমার্জন এইরকম ক্রমসঞ্চয়মূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়বে, এবং এর ফলে ভবিষ্যতের অভিযাত্রীদের কাছে একসময়ে জায়গাটির বিস্তারিত একটা ম্যাপ থাকবে।

উদ্ভাবনী গবেষণার ক্ষেত্রে দুই ধরনের শিক্ষারই মূল্য আছে। কিছু বিশ্লেষণী পদ্ধতি এবং মৌলিক কিছু তথ্য না শিখলে এগনো যায় না। সেখানে প্রথম ঘরানার শিক্ষকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কী জানি না সেটা জানা, না জানা জিনিস নিয়ে ভাবনাচিন্তার বিকাশ কীভাবে করা যায় সেটা বোঝা, এবং নতুন কিছু বলতে পারার জন্যে কোন পথে হাঁটলে কাজ হতে পারে সেই পথপ্রদর্শনের জন্যে দ্বিতীয় ধরনের শিক্ষার পদ্ধতির বিকল্প নেই।

আসলে বিস্ময় এবং সংশয়বোধই একজন গবেষককে একজন পণ্ডিতের থেকে আলাদা করে। অনেক কিছু জানা বোঝা এক জিনিস, আর গবেষণার মধ্যে দিয়ে নতুন কিছুর সন্ধান করা আর এক জিনিস। গবেষণা বিষয়টা কী এবং পড়াশোনা করা বা পাণ্ডিত্যের থেকে সেটা কীভাবে আলাদা, সেটা আমি প্রথম শিখেছিলাম অভিজিৎদার কাছ থেকেই। তবে সবই যে সুখের বা আনন্দের মুহূর্ত ছিল তা নয়। এরকম অনেকবার হয়েছে যে দারুণ উৎসাহ নিয়ে খেটেখুটে কিছু একটা করে নিয়ে গিয়েছি দেখাতে, অভিজিৎদা পুরো উৎসাহে জল ঢেলে দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, আইডিয়াটা মন্দ নয় কিন্তু তুমি এটা নিয়ে কাজ না করলেও বা ক্ষতি কী- অন্য কেউ করুক! তুমি আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক কোনও প্রশ্ন নিয়ে ভাব।

তিন দশক বাদেও অভিজিৎদার সঙ্গে ওই সময়ের কথোপকথনের রেশ আমার চিন্তার মধ্যে রয়ে গিয়েছে। এখনও আমার কোনও ছাত্র বা ছাত্রী যখন তাদের গবেষণার বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে আসে, আমি তাদের তিনটে প্রশ্ন করি: প্রথমত, তোমার ভাবনাটা কী গুরুত্বপূর্ণ বা প্রাসঙ্গিক কোনও বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারে? না হলে যত চমকদারই হোক, সেই কাজের প্রভাব সীমিত হতে বাধ্য। দ্বিতীয়ত, তুমি কি সত্যি নতুন কিছু বলছ নাকি তোমার বক্তব্য আমরা অন্যদের গবেষণা থেকে ইতিমধ্যেই যা জানি তার থেকে সহজেই আন্দাজ করে নেওয়া যায়? শুধু প্রাসঙ্গিক হলে হবে না, আমাদের প্রথাগত ভাবনাচিন্তার স্রোতে তোমার কাজ নতুন কোনও ঢেউ তুলতে পারে কি না, ভাবতে হবে। আর, তৃতীয়ত, তোমার কাজ থেকে গবেষকরা নতুন কোন পথের দিশা পেতে পারেন? সবক'টা প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হলে পরেই সেই কাজ উদ্যম সহ ঝাঁপ দিয়ে পড়ার যোগ্য, তার ফলাফল যাই হোক না কেন।

এখনও গবেষণার নতুন কোনও কাজে হাত দেওয়ার আগে, এমনকী নতুন কোনও উত্তরসম্পাদকীয় বা প্রবন্ধ লেখার সময়েও মাথার মধ্যে এই চিন্তাগুলো ঘোরে: নতুন কিছু বলো, নতুন কোনও তথ্য পেশ করো, পরিচিত প্রশ্নের নতুন কোনও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উত্তর দাও, উত্তর না জানা থাকলেও নতুন প্রশ্ন তোলো, নিজে ভাবো, পাঠককে ভাবাও। পরীক্ষার উত্তর তো লিখছ না যে গুছিয়ে সামারি করে দিলেই ভালো নম্বর পাওয়া যাবে! বুঝতে পারি, এ হল আমার পিএইচডি করাকালীন অভিজিৎদার কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার ফল।